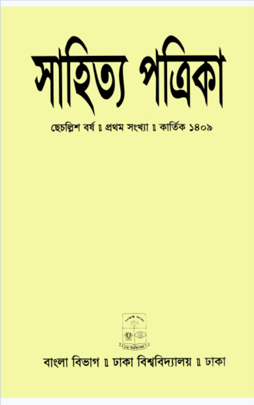

Vol. 46 | No. 1 | 2002

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

জীবনানন্দের ছোটগল্পে মানববীক্ষার স্বরূপ

Volume	46
Issue	1
Year	2002
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	ফারজানা সিদ্দিকা
Published online	October 1, 2002
DOI	10.62328/sp.v46i1.344
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v46i1.344
Pages	৬৩-৮৭
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

জীবনানন্দের ছোটগল্পে মানববীক্ষার স্বরূপ

Check for updates

ফারজানা সিদ্দিকা *

কবিতা কিংবা উপন্যাস বিষয়ে জীবনানন্দ দাশ তাঁর নানা অভিমত প্রকাশ করলেও ছোটগল্প বিষয়ে তিনি একেবারেই নিশ্চুপ। অথচ তাঁর কালে ছোটগল্পও কবিতার মতোই নিরীক্ষার বিষয়। নিকট অতীতে রবীন্দ্রনাথের হাতে ছোটগল্পের পরিপূর্ণতা ও বিকাশের পর্বান্তর জীবনানন্দ দাশের কালেও ছিল সরব। জীবনানন্দ দাশ উপন্যাস লিখছেন, এ তথ্যটি তাঁর ঘনিষ্ঠ দু-একজন জানলেও গল্প লেখার বিষয়টি ছিল একেবারেই অজ্ঞাত। তিনি নিজেই হয়তো গল্প লেখার বিষয়টি প্রকাশ করতে চাননি। আর প্রকাশ না-করার আগ্রহ থেকেই হয়তো বাংলা ছোটগল্প বিষয়ে কোনো প্রবন্ধ লেখেননি। তবে কবিতা-বিষয়ক প্রবন্ধগুলোতেই কবিতা কিংবা অন্য যে-কোনো শিল্প সৃষ্টিতে শিল্পীর দায়বদ্ধতার বিষয়টি এতটাই স্পষ্ট বিবৃত যে, কবি ঔপন্যাসিক প্রাবন্ধিক কিংবা গল্পকার জীবনানন্দ দাশের মননশীলতাকে ব্যাখ্যার প্রয়োজন পড়ে না। তিনি লিখেছেন—

> জীবন ছাড়িয়ে কোনো মানবীয় অভিজ্ঞতা থাকা কি সম্ভব। কবির অভিজ্ঞতা যা আকাশ পাতাল সমস্তই উপলব্ধি করে নিতে চায় তাও তো মানবীয়। অবশ্য এরকম কবি আছেন– বা কাব্য নিয়তির পথে এমন সব মুহূর্ত মাঝে মাঝে এসে পড়ে যখন মনে হয় কবির ভাবপ্রতিভা এমন এক অপরূপ অপ্রশান্তির আস্বাদ পেয়েছে যা জীবনের কোনো ব্যবহারের ভিতরই ধরা পড়ে না, জীবনের প্রতিবিম্বও নয়, আমাদের এই ইতিহাসসম্মত জীবন ছাড়িয়ে কবিমানসের কোনো অনন্য অভিজ্ঞতার দেশে চলে গিয়েছে। কোনো কবি যদি এরকম মনে করেন তা হলে বুঝতে হবে যে তিনি কালকের বা আজকের নিত্যব্যবহার্য সমাজপদ্ধতির বাইরে কোনো কিছুর কথা ভাবছেন, কিন্তু তবুও জীবনের বাইরে কোথাও চলে যেতে পারেননি। কারণ জীবন,– এই জীবনের পদ্ধতি যে-কোনো সমাজ ও সমবায় পদ্ধতির চেয়ে বড়, এরই ভিতরে মানুষের সমবায়-ব্যবস্থা বার বার ভেঙে যাচ্ছে ও নতুনভাবে গড়ে উঠছে। আমাদের এই গ্রহের জীবনসাক্ষ্যের সবচেয়ে

---

* প্রভাষক, বাংলা ভাষা, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট।

> স্মরণীয় দৃষ্টান্ত মানুষ; কোনো বিস্ময়কর প্রমত্ততার মুহূর্তেও নিজেকে অন্যরূপ কল্পনা করা তার পক্ষে কঠিন; তার কল্পনা প্রতিভার চমৎকার সংহতির মুহূর্তে মানবজীবন সম্পর্কে সবচেয়ে মূল্যবান কথা আবিষ্কার করবার কিংবা নতুনভাবে প্রচার করবার সুযোগ সে পায়। এইসব সময়ই হচ্ছে কাব্য বা শিল্পসৃষ্টির সময়।[১]

কবিতা বা শিল্পের দায়বদ্ধতার প্রশ্নে নিজের অবস্থানকে এভাবেই স্পষ্ট করেন জীবনানন্দ দাশ। সমাজ সভ্যতার কাছে তাঁর যে দায়, সে-দায় শোধের অকৃত্রিম প্রচেষ্টা অব্যাহত থেকেছে তাঁর কবিতায় এবং গল্প উপন্যাসে। যদিও গল্প-উপন্যাসে দায়বদ্ধতার আবিষ্কার কবিতার চেয়ে অনেক পরে ঘটেছে। তবু কবিতা এবং গল্প-উপন্যাসের নিবিড় পাঠে, অনায়াসে পাঠক এই দুই ভিন্ন শিল্পের মধ্যে একটিই ঐকান্তিক সমসূত্র উপলব্ধি করতে পারে। কবিতায় সময়কে তিনি প্রাগৈতিহাসিককাল থেকে যেভাবে টেনে নিয়ে আসেন আজকের সময়ে, প্রতিনিয়ত সমাজসভ্যতার সমবায়-ব্যবস্থা ভাঙনের এবং নতুনভাবে গড়ে ওঠার যে উপলব্ধিকে সংযত বিনির্মাণে ধারণ করেন, গল্প-উপন্যাসের ধারাভাষ্যেও থাকে সেই একই উপলব্ধির অনুরণন।

জীবনানন্দ দাশ বিশেষ কোনো সময়ের প্রেক্ষণবিন্দুতে দাঁড়িয়ে, সেই সময়েরই ইতিহাস ও পরিবর্তনকে বুঝে নিতে চেয়েছেন। কবিতায় চিত্রকল্প উপমার আড়ালে এই বুঝে-ওঠায় যে-বিস্ময়কর বোধ স্পষ্ট হয়, সেই বোধকেই তিনি আড়াল থেকে বের করে আনেন গল্পে-উপন্যাসে। যা-কিছু কবিতায় অস্পষ্ট, অব্যাখ্যাত থেকে যায়, যেখানে কবির বোধ প্রকাশ বাধা পায় সেই সব বাধাকেই যেন জীবনানন্দ দাশ গল্প-উপন্যাসে সহজ করে তোলেন। যার ফলে, যে অগণন মানুষের অস্পষ্ট কিন্তু তীক্ষ্ণ অবস্থান কবিতায় ভিড় করে সেই সব মানুষেরা গল্প উপন্যাসে সকল অস্পষ্টতা থেকে বেরিয়ে আসে অবলীলায়। কবিতায় এইসব মানুষকে বুঝে নিতে প্রতিনিয়ত আটকে যেতে হয় উপমায়, ছন্দের হিসেব-নিকেষে কি পরাবাস্তবতার মায়াজালে। কিন্তু গল্পে আটকে যাবার আশঙ্কা কম। জীবনানন্দ দাশ তাঁরই নিজস্ব সময়ের মানুষদের তুলে আনেন তাঁর গল্পে।

সময়ের প্রক্ষেপে একটি অভিন্ন সমাজ ব্যবস্থায় কীভাবে ভিন্ন ভিন্ন সত্তায় বেঁচে থাকে এক একটি মানুষ সেই সব ভিন্ন ভিন্ন মানুষের সন্ধান পাওয়া যায় তাঁর গল্পে। তাঁর গল্পের মানুষগুলোই বৃহৎ প্রেক্ষাপটে উপন্যাসেও অবস্থান করে। বলা যায়, গল্পগুলোরই বৃহৎ রূপ প্রকাশ পেয়েছে উপন্যাসে। জীবনানন্দের জীবনবোধ এবং উপলব্ধি গল্প এবং উপন্যাসে প্রায় অভিন্ন।

বৃহৎ সমাজের নির্দিষ্ট ছকেবদ্ধ গুটিকয়েক মানুষের উপলব্ধিকে ছোটগল্পে অন্বেষণ করেছেন জীবনানন্দ দাশ। প্রায় সবগুলো গল্পে একই রকম মানুষের আনাগোনা। তাই "তাঁর লেখাগুলোতে বৈচিত্র্য কম। সেগুলিতে পুনরুক্তি অজস্র। তিনটি কী চারটি চরিত্র ঘুরে ফিরে আসে, সব মিলিয়ে তিনটি কি চারটি বিষয়ের প্রকাশেই তাঁর মনোভাবনা সংহত।"[২] তবে, এই মানুষগুলোর শ্রেণীগত অবস্থান লেখক অতি সচেতনভাবে স্পষ্ট করলেও, ধর্মীয় অবস্থান সম্পর্কে বিস্ময়করভাবে নীরব থাকেন। বেশিরভাগ গল্পে একান্নবর্তী পরিবারের জীবনচর্চার উল্লেখ থাকলেও, সেই জীবনে ধর্মীয় চর্চার কোনো উল্লেখ নেই। পরিবারগুলো না ব্রাহ্ম না হিন্দু, কোনো অবস্থানেরই প্রতিনিধিত্ব করে না। ভাবতে অবাক লাগে, যে মধ্যবিত্ত পরিবার বারবার জীবনানন্দের গল্পে উঠে আসে, তিরিশের দশকে সেই পরিবারগুলোর কোনোপ্রকার ধর্মহীন জীবনচর্চা কী করে সম্ভব? অন্যদিকে জীবনানন্দের বাবা বরিশালে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠায় এবং ব্রাহ্মধর্ম রক্ষার বিশেষ দায়িত্বে ছিলেন। সুতরাং অনুমান করা যায়, তাঁর পরিবারেও ব্রাহ্মধর্ম চর্চার আবহ বেশ ভালোভাবেই ছিল। গল্পের কাহিনীগুলোর সাথে জীবনানন্দ দাশের ব্যক্তিজীবন ও পারিবারিক জীবনের বিস্ময়কর মিল খুঁজে পাওয়া গেলেও ধর্মচর্চা প্রসঙ্গের অনুপস্থিতি পাঠককে বিস্মিত করে। গল্পগুলোতে বরং মাঝে মাঝে কয়েকজন প্রাজ্ঞ পিতার সন্ধান পাওয়া যায়, যাদের ধর্মীয় বা আত্মমুক্তির উৎস উপনিষদ।

প্রায় গল্পেই পরিবেশ-সঙ্কটের কথা থাকলেও তাকে ছাপিয়ে ওঠে মানুষের আত্মিক-সঙ্কট। এই আত্মিক-সঙ্কটের সন্ধানই তাঁর জীবন-জিজ্ঞাসার বিশেষ স্তর ও জটিলতম অধ্যায়। এখানেই তিনি বেঁচে-থাকা বিষয়ে কিছু নতুন তথ্য দেন পাঠককে। হয়তো এই তথ্যগুলো বাংলা কথাসাহিত্যে নতুন নয়, কিন্তু তাঁর আগে বা পরে এইভাবে এই তথ্যগুলো অন্য কেউ দেননি। কথাসাহিত্যে পরিবেশ-সঙ্কট থাকাটা অস্বাভাবিক নয়। মানুষের বেড়ে ওঠার সঙ্গে-সঙ্গে ঘটে পারিপার্শ্বিকের সংঘাত। "কিন্তু মানুষের মনে নিজের কামনা ও কর্তব্যের মধ্যে যে-নিরন্তর ঘর্ষণ, বেঁচে থাকার অর্থ ও সার্থকতা বিষয়ে মানুষের যে-কণ্টকময় আত্মজিজ্ঞাসা"[৩] — শুধু তাকে কেন্দ্র করে এমন অন্তর্মুখী কথাসাহিত্য বাংলা সাহিত্যে বেশি নেই। জগদীশ গুপ্ত বা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখায় এই জাতীয় অস্তিত্ব-জিজ্ঞাসা মাঝে মাঝে ছায়া ফেললেও শেষ পর্যন্ত তা সমাজ বিশ্লেষণ ও নানাজনের উপাখ্যান হয়ে দাঁড়ায়। সেখানে লেখকের আত্মপ্রক্ষেপ থাকে কিন্তু তা তাঁর আত্মার দর্শন হয়ে ওঠে না। সতীনাথ ভাদুড়ীর *সংকট* বা *দিক্‌ভ্রান্ত*, রবীন্দ্রনাথ

ঠাকুরের *চতুরঙ্গ* উপন্যাসে আত্মিক প্রশ্নকে অনুসরণ করে এই ধরনটি দেখা গেলেও সেখানে একটি 'গল্প' বলার ইচ্ছা থেকে আরও পাঁচটি দিক তুলে ধরার চেষ্টা থাকে। কিন্তু জীবনানন্দ দাশের বেশিরভাগ কথাসাহিত্যে—

> শুধু নিজের মনে প্রশ্নগুলি সারাক্ষণ কাঁটার মতো উঁচিয়ে থাকে– আমি কী? আমি এমন কেন? আমার কী হওয়া উচিত? আমি কি আর কিছু হতে পারি? আত্মসত্তার মুখোমুখি এই প্রশ্নগুলি নিয়ে এসে দাঁড়ানোই তাঁর গল্প উপন্যাসগুলোর মূলকথা– প্রায় একমাত্র কথা। প্লট সাজানোর বা বাস্তব বর্ণনার কোনো দায় তিনি স্বীকার করেন নি।[৪]

ফলে তাঁর গল্পের যে-চরিত্রটিকে তিনি গুরুত্ব দেন, তাকেও তিনি অনেকখানি নিরাবরণ আতিশয্যহীন করে প্রকাশ করেন। চরিত্রকে বানিয়ে তোলা বা ফেনিয়ে ফাঁপিয়ে প্রকাশ করতে তিনি বিমুখ, তাই পাঠক পায় অলঙ্কারহীন নিরেট বাস্তব চরিত্রের সন্ধান। কখনও কখনও এই নিরেট বাস্তবতা পাঠককে হতচকিত করে।

যৌথ পরিবারকে আশ্রয় করে বেশিরভাগ গল্প গড়ে উঠলেও যৌথ পরিবারের সরবতা তেমন নেই। অনায়াসে লেখক যৌথ পরিবারের মধ্যে থেকেও মূল চরিত্রকে বিচ্ছিন্ন করে নেন। পরিবারের অন্য চরিত্রগুলোকে লেখক যেন ইচ্ছে করেই এড়িয়ে যান। কোনো কোনো গল্পে মূল চরিত্র বা নায়কের সঙ্গে শুধু তার বাবার কিছু সংলাপ থাকে। সে-সব সংলাপও বৈদগ্ধ্যে ভরা ['অস্পষ্ট রহস্যময় সিঁড়ি' (১৯৩৬)]। বাবা-মার উপস্থিতি বেশিরভাগ সময় থাকলেও জীবনানন্দ দাশের গল্পে মা চরিত্রটি কখনও শ্রদ্ধা জাগায় না বরং বাবার চরিত্রের বিপরীত মেরুতে অবস্থান করে। মনে হয়, বুদ্ধিহীন সাংসারিক যে মেয়েমানুষেরা তাঁর বেশিরভাগ গল্পের নায়িকা, তাদেরই বেশি বয়সের রূপ মা চরিত্রগুলি।

তাঁর গল্পে আরও একটি বিষয় স্পষ্ট হয়, তিনি কখনওই কোনো গল্পে নিম্নবিত্তের কথা বলেননি। ক্ষয়িষ্ণু মধ্যবিত্ত তাঁর গল্পের মূলকেন্দ্রে অবস্থান করে। এর বিপরীতে নতুন ধনবাদী সমাজব্যবস্থায় গড়ে ওঠা উচ্চবিত্তের কাহিনীকেও অবলম্বন করেন তিনি। তবে এধরনের কাহিনীর সংখ্যাও কম। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'প্রাগৈতিহাসিক' বা শরৎচন্দ্রের 'মহেশ' গল্পের মতো হতদরিদ্র শ্রেণীর সন্ধান জীবনানন্দ দাশের গল্পে পাওয়া যায় না।

অর্থনৈতিক মন্দার সেইসব দিনে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। কাজের অন্বেষণে গ্রামের মানুষ শহরমুখী হচ্ছে। জীবনানন্দ দাশের গল্পের নায়কেরা নিরন্তর এই সংগ্রামে নিয়োজিত থাকে। কাজের খোঁজে,

অর্থনৈতিক সচ্ছলতার সন্ধানে তাঁর নায়কেরা বাড়ি ছেড়ে কলকাতা, শিলং, দিল্লি, মাদ্রাজে চাকরি কিংবা ব্যবসার জন্যে চেষ্টা করে। তবে, বেশিরভাগ গল্পের নায়কেরা মফস্বলেই থাকে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় সমালোচকের অভিমত—

> কলোনির বাংলাদেশে এই মফস্বলকে একপক্ষে বিচ্ছিন্ন করেছে অন্যপক্ষে উন্মুল করেছে। তাদের বাড়িতে-বানানো মতাদর্শে আছে এক ধরনের ব্যঙ্গাত্মক একরোখামি। সেই জন্য তাঁর চরিত্ররা এক সঙ্গে ভদ্র এবং তাড়িত। তাদের মধ্যে জনসাধারণের ছাপ আছে কিন্তু তারা জনসাধারণ নয়। এই ভদ্র কল্পিত মানুষেরা পরস্পরকে চেনে। মফস্বলের গণ্ডির মধ্যে শিক্ষার স্বাতন্ত্র্য আছে, কিন্তু তির্যকতা নেই। তারা সর্বস্ব খোয়ানো জীব কিংবা সত্তা নয়। এক ধরনের স্তিমিত জীবনযাত্রায় তারা অভ্যস্ত, সে জন্য গ্রামের ধাক্কা এবং শহর কলকাতার প্রবলতা কোনোটাতেই তারা আরাম পায় না।[৫]

এইসব সাধারণ প্রবণতার মধ্য দিয়ে জীবনানন্দ দাশের গল্পে তাঁর চরিত্রগুলোর সন্ধান পাওয়া যায়। ঘুরে ফিরে তাঁর গল্পে তিন/চারটি চরিত্রেরই পদচারণা সুনিশ্চিত করেন তিনি। মাঝে মাঝে মনে হয়, জীবনানন্দ যেন এই তিন/চারটি চরিত্রকেই জীবনের নানা বাঁকে, নানা কোণে, নানা স্তরে বিচার করতে চেয়েছেন। এই তিন/চারটি চরিত্রের মধ্যেই পরস্পর মূল্যবোধবিরোধী মানুষের কোলাহল পাওয়া যায়, যারা কি-না একই সময়ের, একই সমাজের ঘেরাটোপে আবদ্ধ।

ক.

জীবনানন্দ দাশের গল্পে শিল্পিত হয়েছে সমাজের উঁচুতলায় বাস করে এমনই কিছু মানুষের জীবন, প্রবল অর্থনৈতিক মন্দার দিনেও যাদের ব্যবসা ফুলে-ফেঁপে দিনে দিনে বেড়েই চলেছে। তাদের অর্থের সঠিক উৎসের ব্যাখ্যা তারা নিজেরাও দিতে পারে না। যুদ্ধোত্তরকালে মধ্যবিত্ত বাঙালির মধ্যে যে মূল্যবোধের বিনষ্টি ঘটেছিল এবং তারই ফলে যেসব মূল্যবোধহীন, নীতিবর্জিত অসৎ মানুষদের উত্থান ঘটেছিল সমাজে— তাদের দম্ভ, ঘৃণা, হিংসা, আক্রোশ ও বিকৃতির চিত্র তুলে ধরেছেন জীবনানন্দ দাশ। 'বিলাস' (১৯৪৭) গল্পের সূচনা থেকেই অতুলনীয় ভাষা ও শ্লেষ অলঙ্কারের তীক্ষ্ণ ব্যঞ্জনা মিশিয়ে শান্তিশেখরের বেদনা ও বঞ্চনা, ঘৃণা ও প্রতিরোধ এবং শান্তিভোগের মধ্য দিয়ে কাহিনীটি গড়িয়ে গেছে আস্তে আস্তে সর্বেন ঘোষের দাম্ভিক, কামুক, ইতর ও প্রতিহিংসাপ্রবণ চরিত্রের উদ্‌ঘাটনে এবং তার মধ্যেই

আস্তে-আস্তে ফুটে উঠেছে মনোবৃত্তির প্রতি-তুলনা। যে আমেরিকান পত্রিকা অফিসে শান্তিশেখর কাজ করে তাদের সঙ্গে কথা ছিল ফি সপ্তাহে কিছু কিছু লিখবার, বড় বড় লিখিয়েদের দিয়ে কিছু লিখিয়ে নেবার– কিন্তু বাঙালি সাহেবরা প্রুফ দেখার কাজ তার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছে, রাত দশটা পর্যন্ত শুধু প্রুফ দেখাই এখন তার কাজ। শান্তিশেখরের জীবনে দুটো আক্ষেপ। এক. যে দামি দরকারি বইগুলো সে কিনেছে তা পড়বার সময় বের করা এবং দুই. একজন নারীকে আন্তরিকভাবে ভালোবাসা। পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় সাহেবরা অর্থের বিনিময়ে কেড়ে নিয়েছে তার সময় এবং প্রত্যাশিত নারীদেরও। আমেরিকান অফিসে বাঙালি সাহেবদের সঙ্গে শান্তিশেখরের সম্পর্কের মধ্যে একটা স্বার্থপর ও কুটিল সমাজের রূপ ফুটে ওঠে। অফিসের সহকর্মী সুস্মিতা চক্রবর্তীকে কিছুই করতে হয় না। রোজই আসতে হয় এই যা। সুস্মিতা নিজেই তার কাজের ফিরিস্তি দেয় :

> আমার অফিস তো সন্ধ্যের সময় চোপরা মিত্তির গাঙ্গুলিকে নিয়ে, আয়েঙ্গার আসে মাঝে-মাঝে, বৈঠকী আর কী! তিনটের শোতে 'টাইগার'-এ গেছলুম মনমোহন সুরকে নিয়ে; এই তো এখুনি এলুম।
>
> এখানে এসে কী করতে হ'ল?
>
> কিচ্ছু না। রোজই আসতে হয়, এই যা। গাড়িতে।
>
> গাড়িতে?
>
> হ্যাঁ, সর্বেনদার পেট্রল।[৬]

এদের সমাজে নারী-পুরুষের সম্পর্ক শুধুই যৌনতাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। পারস্পরিক ভালোবাসা শ্রদ্ধাবোধ ও বিশ্বস্ততার মধ্য দিয়ে পুরুষ নারীকে কামনা করে না, নারীও নয়। মানবিকতাহীন এই সমাজে সুস্মিতা বা তার পৃষ্ঠপোষক সর্বেন ঘোষের কাছে তাই একজন শান্তিশেখরের মৃত্যু কোনো ভাবান্তর ঘটায় না।[৭] অফিসের একজন সহকর্মীর মৃত্যুতে অফিস ছুটি দেবারও কোনো প্রয়োজন পড়ে না। কারণ অফিসটি বড়, কাজ তার ঢের। অবলীলায় তারা একজন মানুষের অনুপস্থিতিকে পুষিয়ে দেয় "মরে গেছে– সে জায়গায় লোক ভর্তি করে নিলেই হ'ল। দেখতে তো হবে প্রুফ- আমাদের হাতে লোক আছে।"[৮] যথারীতি সেদিনও অফিস ছুটি হয়ে গেলে সর্বেন ঘোষের গাড়িতে দীর্ঘ ভ্রমণে বেরিয়ে পড়ে সুস্মিতা। "জীবন এদের কাছে কত সহজ; স্বার্থপর ও মনুষ্যত্ববিহীন.... তারপরেও জীবনের স্থূলপ্রবাহ নিয়ে ক্ষমাহীন নিষ্ঠুর গতিতে এগিয়ে চলছে।"[৯]

'মেয়েমানুষ'(১৯৩২) গল্পের হেমেন, দ্বিজেনও কি সর্বেন ঘোষের চেয়ে আলাদা? হেমেন ও দ্বিজেন দুজনই অর্থনৈতিকভাবে সুবিধাজনক অবস্থায় আছে। এদের দুজনার স্ত্রী চপলা ও লীলা। গল্পে চপলা ও হেমেনের সংসারের বর্ণনা মেলে :

> চপলার বয়স পেরিয়ে গেছে– হেমেনের ঊনপঞ্চাশ। দুজনেরই শরীর মোটা হয়ে চলেছে– মাথার চুল পাতলা হয়ে আসছে। হেমেনের প্যান্টের বেল্ট তার ভুঁড়ির মতই; চপলার মুখও হেমেনের মতই যেন- কল্পনা বা স্বপ্নের কোন চিহ্ন যেন এদের মুখাবয়বের ত্রিসীমানায়ও কোনোদিন ছিল না। হেমেনের মতই যেন— কয়েকখানা মাঝারি গোছের ট্রাক। ইট, সুরকি ও সিমেন্ট নিয়ে কোলকাতার শহরে ছোটাছুটি করছে দশ বছর ধরে। আরো নানারকম ব্রাঞ্চ বিজনেস আছে। সামান্য কনট্রাকটর হয়ে চব্বিশ পরগনায় জীবন শুরু করেছিল সে। এখন তার সমস্ত ব্যবসার হেড অফিস কলকাতায় দু-তিন লাখ টাকা খাটছে।[১০]

দ্বিজেনেরও অনেক টাকা। কিন্তু স্ত্রী লীলার সাথে তার বনিবনার অভাব। বৈশাখের এক দুপুরে হেমেন-চপলা হাজির হয় দ্বিজেন– লীলাদের বাড়ি। তখন অবিরাম ঝগড়া চলছে দ্বিজেন ও লীলার মধ্যে। দ্বিজেনের অন্য নারীর প্রতি আসক্তির খবর লীলা জানে, তাই আচমকা যখন সে দ্বিজেনের দিকে ছুরি ছোড়ে তখন তার উদ্দেশ্য থাকে দ্বিজেনের চোখের ডিম বের করে দেওয়া। স্টোভের আগুন সে ঘরময় ছড়িয়ে দিতে চায়। ঘৃণায় উচ্চারণ করে "স্বামী আমার! বড্ড স্বামী।"[১১] গল্পের এ পর্যন্তও পাঠক জানে না লীলা কেন এত বিরূপ তার স্বামীর প্রতি। কিন্তু এই ঘটনার কিছু দিন পরে প্রকাশ পায় লীলার প্রতি দ্বিজেনের অসততার সূত্রগুলো। পুঁজিবাদী সমাজে বিশ্বাস ও ভালোবাসাহীন দাম্পত্য জীবনে ক্রমাগত স্বামী ঠকিয়ে যায় স্ত্রীকে। স্ত্রীও স্বামীকে। লীলার বর্ণনায় হেমেনের "টেঁকো মাথা আর বোঁদা চেহারা।"[১২] দেখে কোনো মেয়ে ওর সঙ্গে গাঁট বাঁধতে আসে না। হেমেন নিজেও তার এই ভুঁড়িসর্বস্ব চেহারার দুর্বলতার কথা বোঝে। তার পরও সে সুযোগ খোঁজে , "মেয়েদের ফেরে -ফেরে আমি না থাকি যে তা নয়। কিন্তু চপলা তা জানে না। কিন্তু এদ্দিন অ্যাংলো ইন্ডিয়ান ছুঁড়িদেরকে এনে বায়স্কোপ দেখিয়ে ভাবত সব সাধ মিটল বুঝি। কিন্তু তাতে শুধু হয় না। - আরো কী একটা জিনিশের প্রয়োজন যেন।'[১৩] এই 'কি একটা জিনিশের' অভাব আছে বলেই মেয়েদের চিন্তা হেমেন ছেড়ে দিয়েছে। কিন্তু দ্বিজেনের সে অবস্থা নয়," মেয়েরা আমাকে দেখে ভুলে যায়, আমার কাছে এসে নিজেদের নিবেদন করে– এসব কোন পুরুষ না চায় দ্বিজেন?[১৪]

কিন্তু বন্ধু হেমেনের দুঃখ সে বোঝে আর বোঝে বলেই তাকে মিথ্যে সান্ত্বনা দেয়, "আমাদের পকেটে এখন আর কিছু উঠবে না, শুধু ঘরের বধূ ছাড়া, আমাদের জন্য আর কিছু নেই।"[১৫]

দ্বিজেনের এই মিথ্যে সান্ত্বনায় হেমেন পরিতৃপ্তি পায়। আর এই পরিতৃপ্তি নিয়ে হেমেন যখন বেহালার দিকে বেড়াতে যায় তখন দ্বিজেন ট্যাক্সি ঘুরিয়ে হেমেনের বাড়িতে চপলার কাছে উপস্থিত হয়। দ্বিজেন তেতলায় উঠে দেখল চপলা গড়াচ্ছে। এই বিরাট মেদকে দেখে প্রথমটা তার মন কেমন কুঞ্চিত হয়ে উঠল : কিন্তু তবুও এই মেদের নীচে যে হৃদয় রয়েছে তা এমন চমৎকার– এত নমনীয়। এই মেয়েটিকে নিয়ে আধঘণ্টা এক ঘণ্টা দু ঘণ্টা কাটল দ্বিজেনের ।[১৬]

কিন্তু হেমেন এসে পড়তে পারে। বিরক্তি লাগলেও তাকে চলে যেতে হল। "গিন্নিরাও চায় যে তাদের স্বামী আসুক- এ অতিথি বেরিয়ে যাক, বেরিয়ে যাক। বেরিয়ে সে গেলই।"[১৭] এই চপলার সঙ্গে গল্পের শুরুতে লীলাদের বাড়ি বেড়াতে যাওয়া সংযত, স্থির চপলার কি কোন মিল পাওয়া যায়? এক অদম্য ঘাতক সময়ের প্রভাবে এভাবেই সমাজের উঁচুতলার মানুষগুলো মূল্যবোধহীন স্থূলরুচির পঙ্কে নিপতিত হয়। স্থূলরুচি গড়ে ওঠে যৌনতাকে আশ্রয় করে। সুমিতা চক্রবর্তী বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করেন এভাবে–

> মানুষের জীবনে বেঁচে থাকার বৃহত্তম টান হল যৌনকামনা মিশ্রিত ভালোবাসা। মানুষ ও মানুষের প্রধান যে সম্পর্কটি তাঁর উপন্যাসগুলিতে নির্ণিত হয়েছে তা তীব্র এক শরীর ভোগের সম্পর্ক। যৌনসুখ ছাড়াও তার সঙ্গে জড়িত অন্যান্য ইন্দ্রিয়জ সুখ— রুচিকর খাওয়া, তৃপ্তিকর ঘুম, শীতে উষ্ণতা, গরমে শীতলতার একান্ত শরীর উপভোগ্যতা তাঁর উপন্যাসে যৌনতার দিকে মানুষের দুর্মর প্রবণতা, যৌনসুখের আকাঙ্ক্ষা ও তৃপ্তি সবকিছুর ওপরে। যৌনচরিতার্থতার অভাবে সূক্ষ্মরুচির বোধবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ ব্যর্থ ও নিষ্ফল অস্তিত্ব হয়ে যাচ্ছে ।[১৮]

'হিশেব-নিকেশ' (১৯৩২) এর অবনীশ, অমলা ও রাখালও অদৃশ্য যৌনশক্তির তাড়নায় ব্যর্থ ও নিষ্ফল হয়ে ওঠে। পঞ্চাশ ছাড়িয়েছে অবনীশ, তার স্ত্রী অমলা। ছেলেমেয়ে বড়। অবনীশ চামড়া, ফার্মেসী এসবের ব্যবসা ছেড়ে এজেন্সির বিজনেস করে। প্রচুর টাকা। দুবার বিলেত ঘোরা। জীবনানন্দ দাশ কী নির্লিপ্ততায় অবনীশের নিরাবরণ বর্ণনা দিয়ে চলেন গল্পে—

> বয়স পঞ্চাশ পেরিয়ে গেছে, মাথায় টাক পড়েছে, কিন্তু তবুও মুখখানা কেমন ছেলে মানুষের মত, গালফোলা একটি খোকা যেন— এমন নিরীহ। অথচ ব্যবসার মারপ্যাঁচ এর চেয়ে বেশি কেউ জানে কি? সমস্ত মেদচর্বির শরীরটা যেন একটা তুলোর গদি: গালদুটো তুলোর গদি; পুরু ঠোঁট তুলোর কোলবালিশ; খাঁদা নাক- তুলোর গদি; চোখের বড় বড় ড্যালা দুটোও যেন দুটো গদি- তুলোর অথবা ভুসির।'[১৯]

ব্যবসার হিড়িক, ব্যবসার ফ্যাকরা আন্দাজ করবার সঙ্গে সঙ্গে অতৃপ্তিও তার মধ্যে ভরপুর- ওড়ার ইচ্ছে আছে 'কিন্তু কাকে নিয়ে উড়বে? সমস্ত জীবন ঝেড়েও একটি সুন্দরী মেয়ে মানুষ খুঁজে পায় না সে। কিন্তু তাই বলে স্ত্রীকে নিয়েই যে সর্বদা তৃপ্ত হয়ে থাকতে হবে শুধু, তাও তো নয়। না না, তা মোটেই নয়।'[২০] তার বউ এম্পায়ারে ছটায় নিগ্রো স্পিরিচুয়াল শুনে ন'টায় নিউ এম্পায়ারে যায়– এমনই জীবনধারা। সাতচল্লিশ-আটচল্লিশ বছর বয়সের ব্যবসাদার বন্ধু রাখাল আসে। তার সঙ্গে কর্পোরেশনের টেন্ডার, ব্যবসার আপডাউন, ফার্মের জোচ্চুরি, টাকার জোর, ক্যাপিটালের জোর, সিমেন্ট ও পাটকল, স্ট্রাইক বাঁধানো, লেবার ইউনিয়ন, রুটির ব্যবসা, রেমিংটনের ধাঁচে বাংলা পোর্টেবল টাইপরাইটার, এক গাধামার্কা ইয়াঙ্কির নারকোল তেলের ব্যবসায় ফেল মারা, বাঙালির চেয়ে মাদ্রাজিরা ঢের ছুঁচো, ষোলো হাজার টাকার নষ্ট মরিচ, দুলাখ টাকা নেট প্রফিট- এসব নিয়ে গভীর আলোচনা হয়— রাখালের মতে ব্যবসা একাধারে আর্ট এবং আইডিয়াল। এদিকে অবনীশ আর্ট বোঝে না, যান্ত্রিকভাবে টাকা কামায়, একনাগাড়ে এডগার ওয়ালেস পড়ে। ভালো বই, প্রাইজ পাওয়া সাহিত্য অবনীশ বোঝে না। তার জীবনে প্রেম নেই। অমলা যদি কারো সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করে তাতেও আপত্তি নেই "কিন্তু অবনীশের চোখের সামনে তাকে উপেক্ষা করে অন্য পুরুষের জন্য একটুও"[২১] আগ্রহ দেখালে অবনীশ তা সহ্য করবে না, "বধূ সে ভালবাসে বলে নয়, কিন্তু অন্যের সামনে স্বামীর প্রতি তার ভালোবাসার নিদর্শন অমলা ক্ষুণ্ন করেছে বলে।'[২২] রাখালের সঙ্গে বসে অন্যদিন অবনীশ 'ঢের রুটি-মাখন-কাটলেট-মাংস কলা-আম-কেক-চা'[২৩] ছুরি কাঁটা ধরে খায়। বলে:

দেদার টাকা রোজগার হয়ে গেছে। এখন ছেড়ে দিলেও পারি।

রাখাল বললে- ছাড়বে কেন?

–না ছাড়ব না। কিন্তু কথাটা হচ্ছে এই– কেমন ভালো লাগে না যেন।[২৪]

অবনীশ আরও জানায় দেড় দুলাখ টাকা ব্যাঙ্কে, ফোর্ড বেচে অস্টিন কিনবে। রাখাল বলে হুইপেট কিনতে। অবনীশ বলে ব্রিজ খেলে প্রায়ই রাবার করে, দেদার চুরুট খায়। সাধুসঙ্গ করে। আমলা সম্বন্ধে প্রশ্ন করে রাখাল :

– আজও নেই

– কেন জিজ্ঞেস করছ মিছে?

– এম্পায়ারে?

– কোন ভ্যাম্পায়ারে কে জানে।[২৫]

রাখাল আন্দাজ করে, "এদের সম্বন্ধের মধ্যে যে রাখাঢাকা চমৎকার বিচ্ছিন্নতা আছে–। '[২৬] নিজেও সে জোড়াতালি দিয়ে চালাচ্ছে। অবনীশ অনুভব করে– "এ রকম পজিশন, টাকাকড়ি যদি না থাকত, শুধু যদি এই জানতাম যে সারাজীবন ভগবানে বিশ্বাস রেখে, সৎপথে চলে, অক্লান্ত পরিশ্রম করে এসেছি তা হলেও ব্যাস, আমার মুখের হাসিটি কেউ কাড়তে পারত না–। "[২৭] রাখাল বোঝে এই 'কোলাব্যাঙ' কলঙ্ক করতে পারবে না।

গল্পের শেষে "রাস্তায় নেমে রাখাল ভাবল– এর পর থেকে আমলাকে অবসর মত একটু আধটু দেখবে সে– না হলে মৃত্যু অব্দি এমন একাদশী করে মরবে মেয়েটা?'[২৮]

কিন্তু জীবনানন্দ দাশ আমাদের ভাবিয়ে তোলেন কেন অবনীশ ঘোষাল এত বিত্ত-বৈভবের মধ্যে থেকেও এই পঞ্চাশ বছর বয়সে ভগবানে বিশ্বাস আনতে চাইছে, সৎ পথে চলে অক্লান্ত পরিশ্রম করে একটা পরিচ্ছন্ন তৃপ্তির হাসি হাসতে চাইছে? তার এই ভাবনা কি জীবনের কাছে পরাজয় থেকে? স্ত্রী অমলাকে নিজের আয়ত্তে আনতে না-পারার পরাজয়? অন্যদিকে স্বাধীনভাবে নিজের আকাঙ্খা পূরণ করে যে নারী সেই অমলার জন্যে একাদশীর ভাবনা কেন রাখালের? অন্য কোনো ভোগাবাসনা থেকে নয় শুধু যৌনাকাঙ্ক্ষা থেকেই অমলার জন্যে একাদশীর ভাবনা রাখালের?

জীবনানন্দ দাশ গ্রাম ও মফস্বলের প্রেক্ষাপটে অনেক গল্প লিখলেও উচ্চবিত্তের এই ক্ষয়ের চিত্র পাওয়া যায় কেবল নগরকেন্দ্রিক গল্পগুলোতেই। আসলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী অস্থির সময়কে উচ্চবিত্ত নগরবাসীরা তাদের লাম্পট্যে, যৌনবিকৃতিতে, অসততায় যে ভাবে ধারণ করতে পেরেছিল সে-তুলনায় গ্রামের মানুষেরা তা পারেনি। তাই তো, সুদূর মফস্বল থেকে আসা অসিতের স্ত্রী সীতাও

স্বামীর বন্ধু নগরের পয়সাওয়ালা ধনী মনোহরের লালসার শিকার হয় 'হেমন্তের দিনগুলি' (১৯৩২) গল্পে। অসিত সীতার দাম্পত্য জীবনে যে অর্থসঙ্কট সেই সঙ্কটকে আশ্রয় করেই মদ্যপ মনোহর সীতার দিকে এগিয়ে যায়। তার উদ্দেশ্য থাকে যৌনাকাঙ্ক্ষা নিবৃত্ত করা। এই কারণে সীতাকে টাকাও ধার দেয় মনোহর। কারণ টাকার অভাবই সীতার দুর্বলতা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিন মাসে মেয়ে প্রসব করতে গিয়ে সীতার মৃত্যু হয় এবং এইভাবে মনোহরের চূড়ান্ত লাম্পট্যের হাত থেকে তার মুক্তি ঘটলেও অন্য কোনো সীতা কি মনোহরের হাত থেকে রক্ষা পায়? যেমন রক্ষা পায়নি 'সোমনাথ ও শ্রীমতি' (১৯৪৬) গল্পের শ্রীমতি। অসুস্থ পরিবারের অর্থের সঙ্কুলান করতে গিয়ে বেঁচে থাকার তাগিদে সে উচ্চবিত্তদের বিকৃত কামনা মেটায়। স্বামী সোমনাথের আত্মীয় সুরনাথও বোঝে টাকার বিনিময়ে শ্রীমতির দেহ লাভ করা সম্ভব এবং সে -কথা বলতে গিয়েও ট্রাকের শব্দে চাপা পড়ে যায়। শ্রীমতিও এই ঘৃণ্য জীবন থেকে মুক্তি পায় মৃত্যুর মধ্য দিয়ে।

সময়ের এই বিকৃতি কোনো বয়স এবং সম্বন্ধ মানে না। 'প্রেমিক স্বামী' (১৯৩১) গল্পে মলিনার পয়সাওয়ালা জ্যাঠাশ্বশুর ভুজঙ্গবাবুও বোঝে বিপুল অসামর্থের বোঝা মলিনার স্বামী প্রভাতের মাথায়। সুতরাং দিল্লি বেড়াতে যাবার সময় "মলিনার সিঁদুরসিক্ত মুখটা বুকের ওভার কোর্টের ভিতর জড়িয়ে ধরে মাফলারে চেপে ভুজঙ্গবাবু একটা চুমো"[২৯] খেলেও প্রভাতের যে অভিমান করবারও সামর্থ নেই তা তিনি বোঝেন। আর মলিনাও অসচ্ছল স্বামীর চেয়ে সচ্ছল দূরের আত্মীয়দের সান্নিধ্যই বেশি উপভোগ করে।

বিকৃত যৌনাকাঙ্ক্ষা নেই ভবশঙ্করের। "ভবশঙ্কর একটা মস্ত বড় বাঙালি লাইফ ইনসিওরেন্স কোম্পানির চেয়ারম্যান কিন্তু প্রত্যেক মিটিঙেই সেক্রেটারি তাকে প্যাঁদায়।"[৩০] এই প্যাঁদানির চোটে ভবশঙ্কর প্রায়ই রেজিগনেশন লেটার পকেটে নিয়ে মিটিঙে যায় কিন্তু 'পরম প্রতিষ্ঠার' চেয়ারটি ছাড়ে না। ভবশঙ্কর ছিল দক্ষ ডাক্তার, ডাক্তারি ছেড়ে ব্যবসায় হাত পাকিয়েছে। অঢেল টাকার মালিক। তার বন্ধু হল গঙ্গাধর মিত্তির-সেও কমতি যায় না, ব্যারিষ্টারি ছেড়ে ব্যবসা ধরেছে। দুজনেই বড়লোকের বাপ হয়েছে। ছিল গরিবের ছেলে, দুজনেই দু-তিন লাখ টাকা জমিয়েছে প্রাকটিস করে। তারপর ব্যবসা। ভবশঙ্কর হল বেদ ও আয়ুর্বেদ পড়া। তার সঙ্গে গঙ্গাধরের 'মাদার উইট' -এর বাংলা কী হবে তা নিয়ে তর্ক জমে। ভবশঙ্করের মতে 'কাণ্ডজ্ঞান', 'বোধ' – এসব শব্দই 'মাদার উইট'কে মাদার কাঁটা দিয়ে প্যাঁদাবে। আলোচনা জমে ওঠে– অল বেঙ্গল সু ফ্যাক্টরির চেয়ারম্যান ছিল ভবশঙ্কর, সেই কোম্পানির লাটে ওঠা, জীবনের গোখ্‌খুরি, আইন এড়িয়ে অন্য

জায়গায় গিয়ে ব্যবসা ফাঁদা, বড়-বড় বাড়ি খিঁচে ফেলা- এসব নিয়ে। মিত্তির ঘুঘু। ভবশঙ্কর নয়। ও পাখির জাত আলাদা। "ভবশঙ্কর সেক্রেটারির কাছে প্যাঁদানি খায় এই নিরেট ঘুঘুত্ব লেশহীনতার দরুণ।"[৩১]

এর পরই ভবশঙ্কর অ্যালবার্ট হলে কংগ্রেসের লেফটদের সামনে বক্তৃতা দিতে যায় এবং প্রথমেই বলে বসে, "মাননীয় সভাপতি ভদ্রমহিলা ও মহোদয়গণ- আজ এসময়ে বক্তৃতা দিতে দাঁড়িয়ে আপনাদের আমি স্পষ্টপষ্টি জানিয়ে দিতে চাই যে আমি বলশেভিক নই-"।[৩২] অমনি সমান হাসি, টিটিক্কার বিশাল জনতার মাঝে। ভবশঙ্কর ভয় পায়। এবার তার দিকে জুতো, এমনকি সোডার বোতলও ছোঁড়া হতে পারে। তাকে শুয়ার, গাধা, বনশোল, খাটাশ, ছাগল বলা হতে পারে। ডায়াসে উপবিষ্ট কয়েকজন তাকে এর মধ্যেই 'ব্যাটাচ্ছেলে', 'শালার ব্যাটা' ইত্যাদি বলেছে। "কি বেল্লিক- কি বিরাট বেল্লিক।"[৩৩] মুহূর্তের মধ্যে ভবশঙ্কর ভোল পাল্টে দিল। "রাশিয়ার চাষাভুষোর গুণগান করলে ভবশঙ্কর। নিতান্ত নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সোভিয়েটের গুণগান করলে, বলশেভিকদের জয়-জয় করলে। জয়জয়কার পড়ে গেল ভবশঙ্করের।'[৩৪] এরপর সে ইউরোপকে পথে বসাল, পশ্চিমের তাবৎ সভ্যতাকে রসাতলের অন্ধ তিমিরে পাঠাল, ইকনমিক সিস্টেম, মেডিকেল কাউন্সিল, সিনেমা, থিয়েটার, রয়েল একাডেমি, সেন্টপলের গির্জা, ফ্লিট স্ট্রিট এবং শেষে আমেরিকাকেও পিঁজে, ধুনে শেষ করে দিল। কিন্তু পরদিন দেখা গেল খবরের কাগজে তার ভাষণ সম্বন্ধে তেমন কিছু নেই। মুষড়ে পড়ল ভবশঙ্কর, "একটা সং নাকি সে?'[৩৫] জার্নালিজমের বাপান্ত করল ভবশঙ্কর, "এই তরল খোকারাই দেশের কাগজের জগতের নেতা......।"[৩৬] স্ত্রী মৃণালিনী চা দিয়ে চলে গেল। সে ভবশঙ্করকে কেয়ার করে না। ভবশঙ্কর চা, জেলি মাখানো টোস্ট, ডিম, গোট দুই কলা খেল। খেয়ে আত্মসমীক্ষায় বসল, "বিজনেসে লেগে থাকলে এই হবে শুধু-টাকা হবে আরো টাকা হবে আরো টাকা হবে, আরো টাকা হবে, আরো টাকা হবে।"[৩৭] এ ঘর ও ঘর ঘোরে ভবশঙ্কর। তিনটি বাড়ির মালিক। মার্বেল পাথরের মেঝে, সোফা কিন্তু অনেক দাম দিয়ে কেনা ছবির কোনো অর্থ নেই। তেপায়ার ওপরের বইয়ের অর্থ নেই ড্রইং রুমে শ্বশুরকে প্রণাম করে চলে গেল বউমা। তাকেও ভুলে গেল ভবশঙ্কর। তাকে টাকা জমাতে হবে। জমিয়ে যেতে হবে। অবশেষে সিদ্ধান্তে পৌঁছাল সে। "এ কেমন? কিন্তু যেমনই হোক, একটা ছবি বা সাহিত্য কংগ্রেসের আহ্লাদি বা খবরের কাগজের প্রশংসা বা স্ত্রীকে উপভোগ করতে যাওয়ার চেয়ে- এ ঢের ভাল।"[৩৮] বাস্তবিকই স্ববিরোধী ভবশঙ্কর সমাজে মূল্যবোধহীন জলজ্যান্ত সং হয়েই বেঁচে থাকে। তার টাকা আছে কিন্তু আত্মবিশ্বাস বা সম্মান নেই।

খবরের কাগজে মিটিঙের খবরে ভবশঙ্কর নিজের নাম খুঁজে না- পেয়ে জার্নালিস্টদের যেমন গাল দেয়, তেমিন, 'মেয়েমানুষ' গল্পে হেমেন-চপলা টনটনিয়ে মাড়োয়ারির বাড়ির অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রিত থাকার পরে খবরের কাগজে একশোজন বড়লোকের তালিকায় তাদের নাম নেই দেখে হতাশ হয়। নিজেদের অবস্থানকে তারা এইভাবেই চিহ্নিত করে। মানবিকতাবোধ এদের লুপ্ত। তাই দ্বিজেন-লীলার বাড়ি যাবার সময় চপলার বামে পাশে একজন কুলি দাঁড়ালে হেমেন চপলাকে নিয়ে বাস থেকে নেমে যায়।

ভূঁইফোড়, হঠাৎ গজানো "উচ্চবিত্তদের জীবনের চাকচিক্যের আড়ালের নিরর্থতাকে"[৩৯] জীবনানন্দ দাশ এভাবেই প্রকাশ করেন। এই জাতীয় গল্পগুলোর–

> চরিত্রগুলি– কী পুরুষ, কী নারী– সকলেই অর্থবান, সচ্ছল, সমাজের মইতে মোটামুটি ভালো অবস্থানে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু এরা বিকৃত, অসংলগ্ন, চরিত্রহীন, হাস্যকর ও অন্তঃসার শূন্য। এদের মনে আনন্দ নেই, নিতান্ত প্রিয়জনের সঙ্গেও কোনো স্বাভাবিক বোঝাপড়া, লেনদেনের সম্পর্ক নেই, কেবল রয়েছে টাকা। অঢেল টাকা।[৪০]

টাকাও যেন এই সব গল্পের এক মুখ্য চরিত্র। "সর্বাবস্থায় টাকা করে যেতে হবে। এই হতভাগ্যরা যেন রোমের সম্রাট ভেসপাসিয়েনের দ্বারা অনুপ্রাণিত যিনি সর্বসাধারণের জন্যে নির্মিত শৌচালয়ের ওপর কর বসিয়ে সহাস্যে বলেছিলেন, 'টাকার কোনো দুর্গন্ধ নেই।' এর ব্যবসাদার– নানা রকমের, কিন্তু কোনো কলকারখানার মালিক নয়।"[৪১] সময়টা ছিল দ্বন্দ্বময়। সমালোচক লিখেছেন–

> স্বাভাবিককে অস্বাভাবিক, পবিত্রকে ক্লেদময়, অসম্ভবকে সম্ভব, দা ও কুমড়োর মধ্যে প্রণয়ের অবতারণা ঘটানো, দৃশ্যমান সেই স্বর্ণদেবতা, গোর্কি বর্ণিত সেই হলুদ শয়তান কী না পারে! এ খেলায় ভালোবাসা শান্তি সারল্য সহানুভূতি না পেলেও টাকার ফেরে থাকতেই হবে, টাকার ধান্ধায় কমতি পড়লে চলবে না, ... ওদিকে সব মনুষ্যত্ব জলাঞ্জলি যাক, বিকৃতি ছড়াক দেহে মনে। এ এক প্রেত তাড়িত প্রক্রিয়া।[৪২]

অর্থই সময়কে নিয়ন্ত্রণ করেছে তখন—

> অর্থ হলো সেই পণ্য যার ব্যবহারিক মূল্য সার্বজনীন। অর্থের স্বরূপ শেখার এ এক দৃষ্টিভঙ্গি। অন্য দৃষ্টিভঙ্গিতে অর্থ হলো সেই পণ্য যার বিনিময়-যোগ্যতা সবচেয়ে বেশি। হেমেন, দ্বিজেন চপলা, লীলা, অবনীশ, রাখাল, ভবশঙ্কর– সমস্ত স্বাভাবিক ও মানবিক গুণাবলি

> তালগোল পাকিয়ে নষ্ট হয়ে যাওয়া তিমি মাছ পচনের দুর্গন্ধে সুরভিত প্রাণ মণ্ডলের মধ্যে যে- বিচ্ছিন্ন মানুষগুলো নড়াচড়া করে তাদের জীবনের সব স্বাভাবিকতা নষ্ট হয়ে গেছে। এই বিমর্ষ ও অসুখি এককেরা প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন, নিজের কর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন, মানব সত্তার থেকে বিচ্ছিন্ন। অন্যান্য মানুষ থেকেও বিচ্ছিন্ন। বিচ্ছিন্নতার এই চতুরাশ্রমের কোন-না কোনটি বা একাধিক এই একককদের উপরে ছায়া ফেলেছে।[৪৩]

এই জাতীয় গল্পে নারী নিছক পণ্য, প্রয়োজনবোধে ব্যবহার সামগ্রী। নারীরা অবিশ্বাসী। অবাঞ্ছিত সম্পর্ক তৈরি করে তারা। উড়নচণ্ডী দায়িত্বহীনভাবে ঘুরে বেড়ায়। সমাজে তারা শুধু রূপসর্বস্ব দামি আসবাবপত্র। রূপের মর্যাদাই পায় তারা পুরুষদের কাছে। বুদ্ধি বা মননশীলতার নয়– তারা যেন তার প্রত্যাশাও করে না। নারী–পুরুষের এই বিকৃত জটিল সহাবস্থানের যে চিত্র আলোচ্য গল্পগুলোতে পাওয়া যায়, সেই গল্পের সমাজবাস্তবতা খুঁজতে মুখ ফেরাতে হয় ইতিহাসের দিকে :

> মূল পাণ্ডুলিপির খাতায় লেখা সালের সময়টি রচনাকাল ধরলে একটা প্রশ্ন ওঠে। জীবনানন্দ যে-ধরনের বাঙালি বড়লোকদের কথা বলেছেন এরা কি ১৯৩২-এর না দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ের বাঙালির একাংশ যারা যুদ্ধের বাজারে মন্দভালো নানা কারবার করে ফুলে ফেঁপে উঠেছিল? পরে যে স্ফিতোদরদের টেন্ড্রার, ফাটকাবাজ, ছাঁটমেটালের কারবারি ও পাটের দালাল হিসেবে চেনা গিয়েছিল তারা কি তখন ছিল?.... চ্যাপম্যান সাহেব প্রদত্ত ১৯৩৮ সালের রির্পোটে দেখা যায় যে পিওনের মাইনে ছিল ১৭ টাকা এবং লোয়ার ডিভিশন ক্লার্কের ৩৫ টাকা -এরা কিন্তু সেই টাকাতেই খেয়ে-পরে থাকত। শিক্ষক হিসেবে মাত্র ৫০ টাকা মাইনে পেয়ে, বহু সুবিধার মধ্যেও বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রচুর দায়দায়িত্ব পালন করেছিলেন। সে-সময় হেমেন, দ্বিজেন অবনীশ, রাখাল, ভবশঙ্কর- সকলেই লক্ষ লক্ষ টাকার মালিক! এমনও কি হতে পারে যে দ্রষ্টার মতোই জীবনানন্দ বুঝতে পেরেছিলেন এই ধরনের অসভ্য বড়লোকেরা সমাজে জাঁকিয়ে বসতে চলেছে।[৪৪]

যাই হোক না কেন, "ধনতন্ত্রের এই এক তরফা দমফাইয়ের সময়ে সর্ব্বগ্রাসী ভোগবাদের স্বর্ণযুগে'[৪৫] গল্পের এই চরিত্রেরা নতুনভাবে প্রাসঙ্গিকতা পেয়ে যায়।

খ.

এই একই সময়ের ঘূর্ণাবর্তে এইসব নষ্ট মানুষের বিপরীতে অস্তিত্ব রক্ষার তাড়নায় বিপন্ন থাকে আরও কিছু মানুষ। কারণ, প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর ভারতবর্ষে হঠাৎ করে জন্ম নেয়া ভূঁইফোড় উচ্চবিত্ত শ্রেণীর বিপরীতে মধ্যবিত্তের আত্মিক ও মানসিক ক্ষয়ের মাত্রা বাড়তেই থাকে। মধ্যবিত্ত তাদের সকল প্রকার অর্থনৈতিক সঙ্কট থেকে মুক্তির উপায় হিসেবে উচ্চশিক্ষায় নিজেদের শিক্ষিত করে চাকরি বা উমেদারির প্রতিযোগিতায় নামে। তিরিশের অর্থনৈতিক মন্দার দিনে কলকাতার রাস্তায় হাজার হাজার শিক্ষিত বেকার যুবকদের ভিড়। চাকরিপ্রার্থী যুবকদের মধ্যেও কিছু যুবক যাদের "হৃদয়ে কল্পনার এবং কল্পনার ভিতরে চিন্তা ও অভীষ্টতার স্বতন্ত্র সারবত্তা রয়েছে"[৪৬], তাদের সংঘাত শুধু অর্থের সাথে নয় বরং আরও বড় কোনো 'বিপন্ন বিস্ময়' তাদের ক্রমাগত ক্লান্ত করতে থাকে। এই সব বিপন্ন ক্লান্ত যুবকদের প্রাত্যহিক জীবনের বিচিত্র সংঘাত বর্ণনার মাধ্যমে চিরন্তন অতৃপ্তির স্বরূপ জীবনানন্দ দাশ কিছু গল্পে প্রকাশ করেছেন।

এমনি একটি গল্প 'আর্টের অত্যাচার' (১৯৩২), যেখানে "অর্থনৈতিক নিষ্পেষণে কবিসত্তার আর্তচিৎকার সমকালীন সমাজ-বাস্তবতার স্বরূপ যেমন উদ্‌ঘাটন করে, তেমন স্পষ্ট ধরা পড়ে পরবর্তীকালে কবিতা-বিষয়ক প্রবন্ধগুলোর চিন্তা-বীজ।'[৪৭] গল্পের শুরুতেই সাহিত্যিক তিন বন্ধুর আলোচনায় ক্ষোভমিশ্রিত আক্রমণ এবং সে-সূত্রে অন্তর্গত অস্থিরতা ও বিচ্ছিন্নতা স্পষ্ট হয়। শুরুতেই অবনীশের বিতর্কিত মন্তব্য "যারা লেখক তারা ছাড়া আর কেউ আর্টিস্ট নয়।'[৪৮] এমনকি যারা ছবি আঁকে তারাও আর্টিষ্ট নয়, কেননা, ছবি এঁকে তারা ফাঁকি দেয় মনের খটকাকে। অবনীশ স্পষ্ট করেই বলে, লেখকের মনে কেবল খটকা, অর্থাৎ প্রশ্ন জন্ম নেয় এবং সেই প্রশ্ন সমাজের যাবতীয় আয়োজন সম্পর্কে। ঠিক এরকম চিন্তারই উচ্চরণ ঘটে 'পাতা তরঙ্গের বাজনা' (১৯৩২) গল্পেও, যেখানে বলা হয় "হ্যাঁ, তা মানুষই হোক, বা পাখিই হোক বা হৃদয়ের আবেগ-আকাঙ্ক্ষা-যা কিছু হোক না কেন, যে জিনিশ একটা খটকা নিয়ে আসে, আমাকে সচকিত করে দেয়, আমি তাকে বুঝে দেখি, ভাঙাই, আমার ভাষা ব্যক্তি করি।'[৪৯] অনেক সময়, "কবির আর্ট আয়োজন নয়, শুধু নিস্তব্ধ।"[৫০] আয়োজনের ইশারায় খটকা-সন্ধান এবং তার ব্যাখ্যা-ভাষ্য তৈরি করে বুঝিয়ে দেয়াই আর্টিস্টের কাজ তবে তা সমাজ-সংলগ্ন সচেতনতাকে বাদ দিয়ে নয়। লক্ষণীয়—

> দেবকুমার মনে করে. বিখ্যাত গায়কেরাও অনেকে ইডিয়ট কিন্তু বিখ্যাত লেখক কখনো ইডিয়ট হতে পারে না। অতীত কি বর্তমানে। এর ভেতর দিয়ে তারুণ্যের ঐতিহ্য স্বীকারের প্রবণতা স্বীকৃত হলেও ক্ষোভকে অস্বীকার করা যায় না এবং বোঝা যায় আপন অনন্যতা সম্পর্কে সচেতনতা। আপাত আপত্তিকর এ মন্তব্যগুলোর ভেতর দিয়ে আধুনিক কবি গোষ্ঠীর শৈল্পিক শ্লেষের ছায়া বিস্তারও অসম্ভব নয়। সমাজ-অসম্পৃক্ত ও প্রশ্নহীন আর্টকেই ইডিয়টিক আখ্যা দেওয়া হলো, কিন্তু অবনীশ, দেবকুমার ও নিখিল বিচ্যুত আবেগময় মানবীয় সম্পর্ক থেকে।[৫১]

কারণ "তিনবছর পরে এদের পরস্পরের দেখা হল। কে জানে আবার ত্রিশ বছর পরে হবে হয়ত, কিংবা তিন দিন পরেও হতে পারে। এরা কেউ কারু জন্যে অপেক্ষা করে না, কেউ কারু সঙ্গ চাচ্ছে না।'[৫২] তবু একটা সুনির্দিষ্ট সময় ও সমাজে যে শৈল্পিক আদর্শের উদ্ভব তা তাদেরকে কাছে টানে এবং ঘটে সম-আত্মিক উন্মোচন। এরা লেখে কম কিন্তু পড়ে তার চেয়ে অনেক বেশি। অবনীশের উপন্যাস পাঁচ বছরেও শেষ হয় না, যদিও তার আইডিয়া ও স্টাইল প্রতিমুহূর্তেই বদলে যাচ্ছে। "যখন বের করব তখন মনে হবে তবু যে আমি যা বিশ্বাস করি না, মানি না, সেই পচা পুরনো জিনিশগুলো, যা আমার স্টাইল নয়,–সেই পচা পুরনো এই সব নিয়ে এক বই বেরুল।" [৫৩] ইউরোপীয় সংস্কৃতির তরঙ্গাঘাতে বিক্ষুব্ধ আর অর্থনৈতিক সঙ্কটের দুঃসহ সময়ে অবনীশ নিজস্ব ভাবনার চাপে ক্রমশ অসহায় হয়ে পড়ে। তার বিশ্বাস, আইডিয়া, স্টাইল সবই অস্থিতিশীল, সমাজ কোথাও শিল্পীকে স্থির হতে দেয় না। প্রকাশের সময় না দিয়েই সময় ও সমাজ পরিবর্তিত হয়ে যায়, কোথাও যেন আদর্শ দানা বাঁধে না। জীবন তাই একদিকে স্থিতিশীল আদর্শহীনতার এবং সেই জীবনে বিশ্রামহীন গতি জন্ম দেয় নৈরাজ্যের, অবসাদের। অবনীশ তাই মুহূর্তের আর্টে বিশ্বাসী, চিরন্তনতায় নয়। যে শৈল্পিক অস্থিরতার মধ্যদিয়ে তার যাত্রা সেই অস্থির বোধগুলোকেই সে গ্রন্থরূপ দিতে চায়—

> কিন্তু মুশকিল বড্ড, কেউ তা ছাপাতে চাইবে না, নিজের ছাপাবার পয়সাও নেই, এদিকে রেখে ছাপাবার মুরোদের অপেক্ষা করে কোনো লাভ নেই। কারণ সে সুযোগ যখন আসবে তখন এ লেখার কোনো দাম নেই— আমার কাছে নেই।[৫৪]

এখানে শিল্পীর অসহায়তা এবং আত্মিক অহঙ্কার স্পষ্ট। তারা লিখতে চায়, কিন্তু জীবন তাদের লিখতে দেয় না— এখানেই আর্টের অত্যাচার—

> যে জীবন লিখতে দেয় না তা বিকৃতি-গতি ও বিশ্রামহীনতার, অর্থের অনটনে আত্মিক অপচয় তাদের কুঁকড়ে ফেলে, বিচ্ছিন্ন করে দেয় মানবীয় সম্পর্ক থেকে। তবু অস্তিত্বের প্রশ্নে তারা শেষ পর্যন্ত আশাবাদী, – অবশ্যই তা অত্যাচার ও রক্তপাতের ব্যথা সহ্য করার পর– উত্তরণ ঘটাতে চায় জীবনে।[৫৫]

"এরা প্রত্যেকেই আজও মরতে রাজি আছে। কিংবা সত্তর বছর বাঁচতেও আপত্তি নেই। অবিশ্যি এরা কুকুর- বিড়ালের মত বাঁচবে না শেষপর্যন্ত গিয়ে, এরা তা জানে।"[৫৬] এভাবে গল্পটির দ্বিতীয় পর্যায়ে উন্মোচিত হয় কেন্দ্রীয় চরিত্র নিখিলের অর্থনৈতিক টানাপোড়েন, আত্মিক উন্মোচন ও শিল্পতাত্ত্বিক ধারণা। সংবেদনশীল মানুষের মানবীয় মুক্তি এ -সমাজ দিতে না, যদিও নিখিল আর্টের ভেতর দিয়ে সুস্থ স্বাভাবিক জীবনাচরণ ও বোধের সন্ধানে ব্যাপৃত। সে মুক্তি চায় সঙ্কীর্ণ জীবনের অশ্লীলতা ও আর্টহীনতা থেকে একই সাথে অর্থকষ্টের ক্ষোভ তাকে বিপর্যস্ত করে। এই বিপর্যয় তার জীবনে সংশয় ও নৈরাশ্য বয়ে আনে। ক্রোধমিশ্রিত আত্মপ্রত্যয় ঘোষণা করে, বিরোধিতা করে উকিল-ডাক্তার-ব্যবসায়ীর জীবনবোধের– "এরা ভাতের উপর উঠতে পারল কি কেউ? ভাতের ক্লেদের উপরে?" [৫৭] কিন্তু তারপরই সে বুঝতে পারে, যে জীবন সহজ, সেই জীবন তার জন্যে নয়। সমাজের মধ্যে থেকেও সে আলাদা, নিঃসঙ্গ। এই নিঃসঙ্গতার উৎস ও অনন্যতার রূপ সমাজকেন্দ্রিক হলেও, ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য স্পৃহাও কম ভূমিকা রাখে না।[৫৮] নিখিল বুঝতে পারে, আর্ট মানুষকে না দেয় সুখ, না দেয় সোনা। 'ক্ষণিকের মুক্তি দেয় ভরিয়া' (১৯৩২) গল্পের বিরাজ "আর্টিস্টের প্রাণ নিয়ে পৃথিবীতে এসেছে। সে মনে করে, "কোন ব্যতিব্যস্ততার ভিতর আর্ট টিকতে পারে, দরিদ্রতার ভিতর পারে না, জটিল পরিবারের তোলপাড়ের ভিতর আর্ট কী করে টিকবে?.... বিয়ে করা আর্টিস্টের পক্ষে মারাত্মক।"[৫৯]... "কোন বধূকে দিয়েই আর্টিস্টের একাকী জীবনের কোনো সাহায্য হয় না। আর্টিষ্টকে একাই থাকতে হয়, সাংসারিক সচ্ছলতা নিয়ে।" [৬০] রুগ্ন কন্যার দিকে তাকিয়েও হৃদয়বৃত্তিকে একজন আর্টিস্ট সৌন্দর্যের কাছে খুন করতে পারে বলেই বিরাজ ভাবে "একদল সন্তান কখনোই একটা মর্মান্তিক কবিতার চেয়ে দামি নয়... "[৬১] স্ত্রী কমলা বা তার চেয়ে বেশি সুন্দরী, অমলার কোনো মূল্য নেই তার কাছে।

ঝাউগাছের সারির পাশে দিয়ে যেতে যেতে যেখানে অন্তত নক্ষত্রের মাঠ, যেখানে পরিবারের কোনো ব্যথা নাই সেখানে, "প্রশস্ত জানালার পাশে বিস্তৃত একটা টেবিল নিয়ে নক্ষত্রের বাতি জ্বালিয়ে রাতের বাতাসের ভিতর যে সে বসে আছে ঐশ্বর্যময় লেখক সম্রাট।"[৬২]

'কবিতার কথা' প্রবন্ধেও জীবনানন্দ দাশ যেন এই কথাই বলেন :

> সৃষ্টির ভিতর মাঝে মাঝে এমন শব্দ শোনা যায়, এমন বর্ণ দেখা যায় এমন আঘ্রাণ পাওয়া যায়, এমন মানুষের বা এমন অমানবীয় সংঘাত লাভ করা যায়– কিংবা প্রভূত বেদনার সঙ্গে পরিচয় হয়, যে মনে হয় এই সমস্ত জিনিসই অনেকদিন পর্যন্ত, হয়তো মানুষের সভ্যতার শেষ জাফরান রৌদ্রালোক পর্যন্ত, কোথাও যেন রয়ে যাবে; এই সবের অপরূপ উদগীরণের ভিতরে এসে হৃদয়ে অনুভূতির জন্ম হয়, নীহারিকা যেমন নক্ষত্রের আকার ধারণ করতে থাকে তেমনি বস্তু সঙ্গতির প্রসব হতে থাকে যেন হৃদয়ের ভিতরে, এবং সেই প্রতিফলিত অনুচ্চারিত দেশ ধীরে ধীরে উচ্চারণ করে ওঠে যেন, সুরের জন্ম হয়; এই বস্তু ও সুরের পরিণয় শুধু নয়: কোনো কোনো মানুষের কল্পনা-মনীষার ভিতর তাদের একাত্মতা ঘটে–[৬৩]

'বিস্ময়' (১৯৩২) গল্পের "মেরুদণ্ড খুঁজতে গেলে এই সব কথার কাছে ফিরে আসতে হবে বারবার। কারণ আমাদের গল্পের বাগানে এমন উদ্যোগ, এমন ফুলের চাষ, এমন সার্থকভাবে আজও শুরু হয়েছে কি না তা নিয়ে ঘোরতর সন্দেহ জাগে।"[৬৪] গভীর রাতে রাস্তায় রাস্তায় অনেকক্ষণ পায়চারি করছে সুবোধ। তার ওভারকোটের মধ্যে রয়েছে তার উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি, কোনো প্রকাশকই যা ছাপতে রাজি হয়নি। কলকাতার বেশির ভাগই এখন ঘুমিয়ে পড়েছে তাই সুবোধ স্তব্ধতার স্তবক পার হতে হতে চলেছে। রাতের পাহারাওয়ালাদের সে এড়িয়ে চলতে চায় কারণ," কোনো প্রশ্নের উত্তর দিতে রাজি নয় সে আর।"[৬৫] রাত তিনটের সময় কোথাও না থেমে হেঁটে আসবার সময় :

> হঠাৎ মনে হল কে যেন কোন বাড়ির ওপরের তলা থেকে তাকে ডাকছে, সুবোধ থমকে থেমে গেল, পিছু ফিরে সেই বাড়িটার দিকে তাকাল, কোথাও কোনো শব্দ নেই, সবাই ঘুমিয়ে আছে, হয়ত কেউ ডেকেছিল, হয়ত কাউকে কিন্তু সুবোধকে নয়।

> এই বাড়ি? এই বাড়িটাকে কোনোদিন বিশেষভাবে বুঝে দেখতে যায়নি সে, হয়তো দেখেওনি কোনোদিন; কারা আছে জানে না সুবোধ, কিন্তু তবু একটা ডাকের শব্দ শুনেছিল বাস্তবিক সে ওপর দিকে তাকাতেই বাতাসে একটা জানালা বন্ধ হয়ে গেল দেখেছে সুবোধ. এই বাড়িটার কাছে এসে অনেকক্ষণ তাকে থেমে থাকতে হল, একতলার বারান্দায় উঠে দেয়ালে অনেক্ষণ চুপ করে কান পেতে রইল সে। এ জীবনে এরকম বিস্ময় সে কোনোদিন বোধ করেনি।[৬৬]

এই বিস্ময়কে 'পরম নীলাঙ্গুরীয়বৎ' ধারণ করে সুবোধের বেঁচে থাকার একটা নতুন অধ্যায় শুরু হয়। তিন মাস ধরে কত কষ্ট করে লেখা তার উপন্যাস যে-কেউ নিল না সেই দুঃখকে ভুলে শিল্পীর জীবনের নিষ্ফলতাকে ভুলে তার যে চলাচল শুরু হয় তার বাঁকে-বাঁকে থেকে যায় সেই অস্তিত্বের স্পন্দন, সেই ডাকের অনুষঙ্গ। এমনকী তার স্বপ্নের মধ্যেও থেকে যায় প্রচলিত অর্থে তেমন কোনো ভবিষ্যৎ নয়, বরং যে একদিন ছিল তারই আবার নিখুঁতভাবে দেহধারণ। সুবোধের বিস্ময়ের পাশাপাশি জীবনানন্দ দাশ ছোট্ট একটি সংসার নির্মাণ করেন। স্বামী দিলীপ আর স্ত্রী সতীর সংসার। সতী স্বামী দিলীপকে পেরিয়ে, সংসারকে পেরিয়ে ছেড়ে আসা পুরোনো বাড়িটার জন্যে বেদনা অনুভব করে। কারণ পুরনো বাড়ির জানালা দিয়ে গভীর রাতে কাউকে দেখতে যাবে ঠিক সেই মহাক্ষণে বাতাসে জানালা বন্ধ হয়ে যায়–

> সুবোধ পাশাপশি সতীরও শুরু হয়ে যায় বিস্ময়কে সম্বল করে চলাচল। এই যে সুবোধ ও সতী পরস্পরের পরম অচেনা হয়েও বিস্ময়ের যোগসূত্রে আমাদের যুক্তি বুদ্ধির অতীত কোনো স্তরে পরমাত্মীয় হয়ে ওঠে, এই যে সতীর মৃত্যুতে কোনো নারীর মৃত্যু না-হয়ে এক নবান্নের মৃত্যু হয় বস্তুত, এই অবসানে সুবোধের মধ্যে এই যে জন্ম নেয় এমন এক নিষ্ফলতা যা শিল্পীর নিষ্ফলতার উর্ধ্বে–[৬৭]

এরকমই টুকরো টুকরো বিস্ময়কে সঞ্চয় করে সাহিত্যকে কিছু দিতে চায় 'মহিষের শিং' (১৯৩২) গল্পের চারু। গল্পে রানী ও শোভনা দুই বোন যারা চারুর কাছাকছি থাকে। রানী সুন্দরী। অনেকেই ওর মুখের চমকে আকৃষ্ট হয়ে ওকে ভালোবাসে। কিন্তু রানীকে দেখে চারুর কোনো লালসা জাগে না। শোভন, যার চোখের তারায় যেন দুটো দুরন্ত হরিণ- তাকে ভালোবাসে চারু। চারু কবি। কিন্তু তার কবিতাকে শোভনা অগ্রাহ্য করে। অন্যদিকে রানী চারুর কবিতা বুঝতে পারে। বুঝতে পারে বলেই অনেক গোপন জিনিশ রাখবার মতোই "আস্তে আস্তে, ভাঁজ করে ব্লাউজের ভেতর রেখে দিলে"[৬৮] চারুর কবিতা। কিন্তু–

> কবিতা যখন লিখেছিল একবারও কি ভেবেছিল চারু যে, এই কাগজগুলো কোনো সম্পাদকের টেবিলে কোনোদিন গিয়ে পৌঁছাবে না আর, একটি মেয়ের ব্লাউজের ভিতরে আটকে থাকবে....। রানীও আর ফিরিয়ে দেবে না হয়তো ...। কিন্তু তাতে সাহিত্যের কী লাভ হল? চারু সাহিত্যকে কিছু দিতে এসেছে। আজ নয়, একদিন তবু সে বুঝবে যে, এ কবিতাগুলো সাহিত্য হয়নি। এরপর আরো অনেক কবিতা, আরো অনেক লেখা নষ্ট হয়ে যাবার পরও আরো ঢের নষ্ট করতে হবেই তাকে, তখন সে বুঝবে যে জীবনের প্রথম লেখাগুলো যেমন জায়গায় রয়েছে, জীবনের সব লেখাগুলোও তেমনি এক জায়গায় রাখতে পারত যদি! ৬৯

কিন্তু শিল্পের প্রতি এরকম ঐকান্তিকতা ছাড়াই খুব দ্রুত প্রতিষ্ঠা পেতে চায় দু চারজন শিল্পী-লেকক। 'তাজের ছবি' (১৯৩৩) গল্পের বিজন এমনই একজন স্বপ্নবিলাসী শিল্পী। তার ধারণা, পৃথিবীর আর্টে সে নতুন মাত্রা যোগ করবে। কিন্তু তার জন্যে যে নিরন্তর সাধনা দরকার, তা সে করে না। আত্মকেন্দ্রিক হামবড়া এক শিল্পী বিজন। খেয়ালী, অস্থিরচিত্ত। এসবের ফলেই সে হারায় তার জীবনে আসা দুজন প্রেমময়ী নারীকে। দরিদ্র পিতার মৃত্যু তাকে আরও দরিদ্র করে তোলে। অর্থহীন দরিদ্র জীবনে আর্টকে সে এড়িয়ে চলতে শুরু করে। 'শেষ পছন্দের সময়' (১৯৩২) গল্পের সুবোধও প্রচণ্ড দারিদ্রের মধ্যে উপলব্ধি করে বাস্তবজীবনকে এড়াবার জন্যে আর্ট একটা মিথ্যে প্রলাপ।

অন্যদিকে 'মানুষ-অমানুষ' (১৯৩৩), "কল্প জিনিশের জন্ম ও যৌবন' (১৯৩৩), 'প্রণয়হীনতা' (১৯৩৩) ইত্যাদি গল্পে আপাত সফল লেখকদের বৃত্তান্ত আছে। 'সৃষ্টিকর্মে নিবিড়তার চেয়ে প্রচারমুখিনতাই তাদের উপজীব্য। সাহিত্য সভায়, মজলিশে সুন্দরী মেয়েরা তাদের প্রতি আকর্ষিত হয়, ট্রেনে ফেরার পথে সহযাত্রিনী হয়, কলঙ্ক রটে সেই লেখকদের, তা নিয়ে তারা বেশ উপভোগও করে। তাদের আলোচনায় শুধু, মোটাদাগের কথা, শিল্পীর যন্ত্রণা নেই।'৭০

লেখক-শিল্পীর মনোজগতের বেদনা-যন্ত্রণা-অনুরণন জীবনানন্দ দাশ বিভিন্ন কোণ থেকে পর্যবেক্ষণ করেন। শুধু তাদের ভেতরের জগতই নয় সমাজের অন্যান্যদের সাথে, দরিদ্রের সাথে তাদের সংবেদনশীল হৃদয়ের অনুভূতি, বেদনা, লড়াই, ক্ষয়ের কথাগুলো উঠে আসে। অনেকের মধ্যে থেকেও যারা একা, নিঃসঙ্গ, এই নিঃসঙ্গ মানুষগুলোকে আমরা তাঁর কবিতায় বার বার পাই।

খ. ১

“জীবনানন্দ, কবিতাকে যেমন, গল্পেও তেমনি, অনেক সময় একটি কোনো চিন্তার দ্বারা আক্রান্ত হতেন— তখন তাঁর লেখাগুলিতে পর-পর এই চিন্তারই নানা স্তর দেখা যেত। মতে হত, তিনি এই চিন্তারই নানা আয়তন নানা রচনায় আনছেন।”[৭১] প্রেম বিষয়ক ভাবনার প্রকাশ ঘটেছে এরকম তিনটি গল্প ‘কুয়াশার ভিতরে মৃত্যুর সময়’ (১৯৩১) ‘উপেক্ষার শীত’ (১৯৩১) এবং ‘আকাঙ্ক্ষার কামনার বিলাস’ (১৯৩১) লক্ষণীয়, তিনটি গল্পই ১৯৩১ এর অক্টোবর থেকে নভেম্বরের মধ্যে লেখা। ‘কুয়াশার ভিতর মৃত্যুর সময়’ (১৯৩১) এর নায়ক হিমাংশু বেকার, কবে নাগাদ কাজ পাবে তার নিশ্চয়তা নেই তবু সে বিয়ে করেছে সরোজিনীকে পূর্ব প্রেমিকা অরুণার উপেক্ষা ও অবহেলার প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে। এই বিয়েতে আমন্ত্রিত হয়ে অরুণা এসেছে। হিমাংশু চায় তার বিয়ের কারণে অরুণা কষ্ট পাক। কিন্তু অরুণার মুখে পরিতৃপ্তির হাসি থাকে। এই হাসি দেখে হিমাংশুর প্রতিশোধের স্পৃহা দমে যায়। কিছুদিন পর অরুণারও বিয়ে হয়। প্রেমের সংযম ও বেদনা ওই প্রেমিক-প্রেমিকা বোঝে না। দুজনেই আলাদা আলাদা দাম্পত্যজীবন যাপন করে। কিন্তু অন্তর্গত সুখ তারা পায় কি?

‘উপেক্ষার শীত’ও (১৯৩১) একই রকম গল্প। প্রেমিকা অরুণাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে প্রত্যাখ্যাত হয়ে নায়ক শরদিন্দু ‘চিরকুমার’ থাকবার মতো অনেক সংকল্পের কথা ঘোষণা করে। কিন্তু সময়ের স্রোতে পরিস্থিতি বদলায়। নায়ক বোঝে সারাজীবন প্রতীক্ষার পর যদি বা অরুণাকে পাওয়া যায় তখন কি শরবিন্দুর প্রয়োজন থাকবে অরুণাকে? তাই সে বিয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। অরুণাকে বিয়েতে আমন্ত্রণ করে ঈর্ষা জাগাতে চায়। কিন্তু অরুণা কাকে ঈর্ষা করবে? বরং অরুণা কামনা করেছিল শরদিন্দু তার জন্য প্রতীক্ষা করবে। অন্তত মহৎ গভীর প্রণয় মানুষকে প্রতীক্ষা করতেই তো শেখায়। এই গল্পের নায়ক সেরকম প্রণয়ে ব্যর্থ। স্ত্রীর প্রতি এই ব্যর্থ প্রেমিক কী করে প্রণয়াসক্ত হবে? নাকি শুধু দাম্পত্যের অভিনয়ই তাকে করে যেতে হবে?

‘আকাঙ্ক্ষার কামনার বিলাস’ (১৯৩১) গল্পেও আসন্ন বিয়ের আগে এত দিনের ভালোবাসার মেয়েটিকে একবার নিভৃতে একান্ত করে কথা বলার সুযোগ বঞ্চিত নায়ক প্রমথর বেদনার অনুভূতি প্রকাশ পেয়েছে।

এসব গল্পের নায়কেরা দাম্পত্যজীবনে পূর্ব-প্রণয়িনীর কথা ভেবে ভেবে একধরনের প্রেমের অতৃপ্তিতে ভোগে। কখনও কখনও মন হয়, এই যে

অতৃপ্তিজাত বেদনা তা একান্তই কৃত্রিম। কারণ, প্রেমের মহত্ত্ব এরা বোঝে না বলেই প্রেমিকাকে উপেক্ষা করার জন্যে বিয়ে করার মতো হঠকারী সিদ্ধান্ত তারা নিতে পারে। অথচ যে মেয়েটি তারা বধু করে আনে তার কথা একবারও ভাবে না, বধূটির প্রতি স্বতঃস্ফূর্ত প্রেমবোধও তাদের হৃদয়ে জাগে না।

খ.২

কয়েকজন শিক্ষকের ম্লান মুখের ছবি পাই আমরা জীবনানন্দের কয়েকটি গল্পে। অর্থনৈতিক অসচ্ছলতা জীবনানন্দ দাশকে তাড়া করেছে আমৃত্যু। শিল্পীমন শিক্ষকতা পেশায় পেতে চেয়েছে স্থিতিশীলতা–

> কিন্তু তা সর্বমোট সাতটি কলেজে শিক্ষকতার উদাহরণেও রক্ষিত হয়নি। ১৯২২ সালে সিটি কলেজে শিক্ষকতা শুরু করলেও ১৯২৮ সালে চাকরি হারিয়ে ফিরে আসেন বরিশালে। এর পর কিছুকাল বাগেরহাট কলেজ ও দিল্লীর রামযশ কলেজে শিক্ষকতা করলেও ব্রজমোহন কলেজে শিক্ষকতা লাভের পূর্বে ১৯৩৫ পর্যন্ত ছিলেন বেকার।[৭২]

শিক্ষকতা পেশা নিয়ে তিনটি গল্প উল্লেখযোগ্য যেখানে শিক্ষকদের প্রকৃত শিক্ষার বিষয়টি প্রশ্নের মুখোমুখি হয়।

'ক্ষমা অক্ষমার অতীত' (১৯৩৩) গল্পে এইচ. এল. স্কুলে শিক্ষকতার কাজ পেয়েছে লেখক। ইকনমিক্সের এম. এ. হলেও ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে পড়াতে হয় নিচু ক্লাসে। তার ইচ্ছে ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্য পড়ায় কিন্তু তাকে পড়াতে হয় ভূগোল। উঁচু ক্লাসে ইংরেজী পড়ানোর আবেদন খারিজ করে দেন হেডমাস্টার প্রসন্নবাবু যিনি ১৮৭৪ সালের এন্ট্রান্স পাশ। হেডমাস্টারের মতে ইংরেজী হলো শুধু গ্রামার। সে বরং বিস্মিত হয় এই ভেবে যে, নভেল পড় কী লাভ? এই স্কুলে এম. এ. পাশ বাংলার শিক্ষকদের তদারকি করেন সংস্কৃত পণ্ডিত। এরকম পরিবেশে 'তথাকথিত শিক্ষিত' শিক্ষকদের মাঝে চাকরি রক্ষা ও অর্থপ্রাপ্তির তাগিদে গল্পের নায়ককে ইচ্ছাহীনভাবে শিক্ষকতা করে যেতে হয়। এই ইচ্ছাহীনতার ফল প্রকাশ পায় 'স্বপ্নের ভগ্নস্তূপ' (১৯৩১) গল্পেও। বার বছর আগে ইংরেজীতে এম. এ. পাশ হরিচরণ বাবু এইচ. এল. স্কুলে শিক্ষকতা করেন। "মাস্টারি করতে গিয়ে নিজের অনুভবশীলতা শিশুপ্রীতি কমনীয়তা কীভাবে হঠাৎ হারিয়ে যায় তার প্রতীক কাহিনী, শিশুদের প্রতি সহজাত সহানুভূতি কীভাবে অকস্মাৎ অকারণে নষ্ট হয়ে যায়, মাস্টারসুলভ হিংস্র নিষ্ঠুরতা পেয়ে বসে মানুষকে তারই গল্প।'[৭৩]

'ঐকান্তিক অতীত' (১৯৩৩) গল্পে একজন স্বপ্নচারী হেডমাস্টারের সন্ধান পাওয়া যায়। সে স্বপ্ন দেখে বঙ্কিমবাবুর মতো নভেল লিখবে। সুরেন বাড় জ্যের মতো বক্তা হবে কিংবা রামমোহন রায়ের মতো সমাজ সংস্কারক হবে। অথচ ত্রিশ বছর শিক্ষকতার পর তাকে ম্যানুয়াল নোটবুক লিখতে হয়। কারণ, কবিতার মিল দেওয়া তার পক্ষে অসম্ভব। উপন্যাস লিখতে বসে সে দেখে তা বঙ্কিমবাবুর নকল হয়ে যাচ্ছে। পরম ঐকান্তিকতায় বরং সে নোটবুক লেখে। ব্যঙ্গ না-বুঝে নোটবুকের প্রশংসা শোনে শিশুর সারল্যে।

এই গল্প তিনটি ১৯৩৩ -এর এপ্রিলে লেখা। একই পরিবেশের মানুষগুলোকে জীবনানন্দ দাশ বিভিন্ন মাত্রায় বিচার করেছেন এসব গল্পে।

আর এমনিভাবেই জীবনানন্দ দাশ তাঁর গল্পে একই সময়ে, একই সমাজের অলিগলিতে বিরুদ্ধস্রোত হেঁটে চলা মানুষের মুখগুলোকে আবিষ্কার করেন অসাধারণ নান্দনিকতায়।

তথ্যসঙ্কেত

১। জীবনানন্দ দাশ, 'কেন লিখি', *সমালোচনা সমগ্র,* ১৯৮৩, পৃ. ৮৩

২। সুমিতা চক্রবর্তী, 'জীবনানন্দ এবং তাঁর গল্প উপন্যাস', *জীবনানন্দ : সমাজ ও সমকাল,* ১৯৮৭, পৃ. ২৩

৩। সুমিতা চক্রবর্তী, পূর্বোক্ত পৃ. ২৪

৪। সুমিতা চক্রবর্তী, পূর্বোক্ত পৃ. ২৪

৫। বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, 'জীবনানন্দের গল্পে মফস্বল', *সাহিত্যের অভিজ্ঞতা,* ২০০০, পৃ. ১৫৩

৬। জীবনানন্দ দাশ, 'বিলাস', *জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠগল্প,* ১৯৮৯, পৃ. ৬৩

৭। পূর্বোক্ত পৃ. ৬৭

৮। জীবনানন্দ দাশ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭১

৯। শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়, 'জীবনানন্দের তিনটি গল্প', *জীবনানন্দ : জীবন আর সৃষ্টি,* ১৯৯৯, পৃ. ৭৮৯

১০। জীবনানন্দ দাশ, 'মেয়েমানুষ', *জীবনানন্দ সমগ্র,* চতুর্থ খণ্ড, ১৯৮৭, পৃ. ১৮৬

১১। জীবনানন্দ দাশ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯০

১২। জীবনানন্দ দাশ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯৩

১৩। জীবনানন্দ দাশ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯৭

১৪। জীবনানন্দ দাশ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯৭

১৫। জীবনানন্দ দাশ, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০২
১৬। জীবনানন্দ দাশ, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৩
১৭। জীবনানন্দ দাশ, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৪
১৮। জীবনানন্দ দাশ, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬
১৯। জীবনানন্দ দাশ, 'হিশেব-নিকেশ', *জীবনানন্দ সমগ্র,* চতুর্থ খণ্ড, ১৯৮৭ পৃ. ২০৬
২০। জীবনানন্দ দাশ, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৬
২১। জীবনানন্দ দাশ, পূর্বোক্ত, পৃ. ২১৭
২২। জীবনানন্দ দাশ, পূর্বোক্ত, পৃ. ২১৭
২৩। জীবনানন্দ দাশ, পূর্বোক্ত, পৃ. ২১৯
২৪। জীবনানন্দ দাশ, পূর্বোক্ত, পৃ. ২১৯
২৫। জীবনানন্দ দাশ, পূর্বোক্ত, পৃ. ২২০
২৬। জীবনানন্দ দাশ, পূর্বোক্ত, পৃ. ২২১
২৭। জীবনানন্দ দাশ, পূর্বোক্ত, পৃ. ২২১
২৮। জীবনানন্দ দাশ, পূর্বোক্ত, পৃ. ২২২
২৯। জীবনানন্দ দাশ, 'প্রেমিক স্বামী', *জীবনানন্দ সমগ্র,* সপ্তম খণ্ড, ১৯৯২, পৃ. ১০৯
৩০। জীবনানন্দ দাশ, 'কথা শুধু-কথা, কথা, কথা, কথা, কথা', *জীবনানন্দ সমগ্র,* চতুর্থ খণ্ড, '১৯৮৭, পৃঃ ২২৩
৩১। জীবনানন্দ দাশ, পূর্বোক্ত, পৃ. ২২৯
৩। জীবনানন্দ দাশ, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩১
৩। জীবনানন্দ দাশ, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩২
৩৪। জীবনানন্দ দাশ, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩২
৩৫। জীবনানন্দ দাশ, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩৪
৩৬। জীবনানন্দ দাশ, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩৫
৩৭। জীবনানন্দ দাশ, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩৬
৩৮। জীবনানন্দ দাশ, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪২
৩৯। আবদুল মান্নান সৈয়দ, *জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ গল্প*, ১৯৮৯, প্রবেশক
৪০। নবারুণ ভট্টাচার্য, 'সোনালি বাঘ-প্রেতের কথা: জীবনানন্দের তিনটি গল্প', *এই সময় ও জীবনানন্দ,* ১৯৯৬, পৃ. ১৪১
৪১। নবারুণ ভট্টাচার্য, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪২
৪২। নবারুণ ভট্টাচার্য, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৩
৪৩। নবারুণ ভট্টাচার্য, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৩
৪৪। নবারুণ ভট্টাচার্য, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪২
৪৫। নবারুণ ভট্টাচার্য, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৬
৪৬। জীবনানন্দ দাশ, 'কবিতার কথা', *জীবনানন্দ দাশের প্রবন্ধসমগ্র,* ১৯৯৫, পৃ. ২০

৪৭। সিরাজুল ইসলাম. "আর্টের অত্যাচার" ও জীবনানন্দ দাশের ছোটগল্প', *এবং কথা*, ১৯৯৯ পৃ, ১২৩
৪৮। জীবনানন্দ দাশ, 'আর্টের অত্যাচার', জীবনানন্দ সমগ্র: অষ্টম খণ্ড, ১৯৯৩, পৃ. ১৩
৪৯। জীবনানন্দ দাশ, 'পাতা তরঙ্গের বাজনা' জীবনানন্দ সমগ্র : অষ্টম খণ্ড ১৯৯৩ পৃ. ১০
৫০। জীবনানন্দ দাশ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১
৫১। সিরাজুল ইসলাম. পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৪
৫২। জীবনানন্দ দাশ. 'আর্টের অত্যাচার', জীবনানন্দ সমগ্র: অষ্টম খণ্ড, ১৯৯৩, পৃ. ১৩
৫৩। জীবনানন্দ দাশ. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪
৫৪। জীবনানন্দ দাশ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪
৫৫। সিরাজুল ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৪
৫৬। জীবনানন্দ দাশ. পূর্বোক্ত. পৃ. ১৪
৫৭। জীবনানন্দ দাশ, পূর্বোক্ত পৃ. ২১
৫৮। বিশ্বজিৎ ঘোষ, *জীবনানন্দ জসীমউদ্‌দীন এবং*, ঢাকা : ২০০২, পৃ. ৩০
৫৯। জীবনানন্দ দাশ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৪
৬০। জীবনানন্দ দাশ, পূর্বোক্ত. পৃ. ১১৫
৬১। জীবনানন্দ দাশ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৮
৬২। জীবনানন্দ দাশ, পূর্বোক্ত. পৃ. ১১৯
৬৩। জীবনানন্দ দাশ, 'কবিতার কথা', জীবনানন্দ দাশের প্রবন্ধ সমগ্র. পৃ. ২২
৬৪। সুভাষ ঘোষাল, 'জীবনানন্দের ছোটগল্পের আধুনিকতা'. এই সময় ও জীবনানন্দ. ১৯৯৮. পৃ. ১৩৩
৬৫। জীবনানন্দ দাশ, 'বিস্ময়' জীবনানন্দ সমগ্র: অষ্টম খণ্ড. ১৯৯৩. পৃ. ৩০
৬৬। সুভাষ ঘোষাল, পূর্বোক্ত পৃ. ১৩৩
৬৭। সুভাষ ঘোষাল, পূর্বোক্ত পৃঃ ১৩৩
৬৮। জীবনানন্দ দাশ, 'মহিষের শিং'. জীবনান্দ সমগ্র ঃ সপ্তম খণ্ড, ১৯৯২, পৃ. ১২০
৬৯। জীবনানন্দ দাশ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২১
৭০। অতীন্দ্রিয় পাঠক, 'জীবনানন্দের গল্প জগৎ', শিলীন্ধ্র. ১৪০৫. পৃ. ১০২
৭১। দেবেশ রায়, 'সম্পাদকীয়', জীবনানন্দ সমগ্র : দ্বিতীয় খণ্ড. ১৩৯২, পৃ. ২৪৪
৭২। সিরাজ্রল ইসলাম, পূর্বোক্ত পৃ. ১২৩
৭৩। অম্বুজ বসু, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫৮